উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট, সমাধান বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে

ম. জাভেদ ইকবাল

ফাল্গুনের শেষ, চৈত্রের শুরু। খুলনার উপকূলীয় কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের গৃহিণী আম্বিয়া খাতুনের প্রতিটি সকাল শুরু হয় এক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ঘুম থেকে উঠেই তাঁর প্রথম চিন্তা পরিবারের জন্য খাবার পানি সংগ্রহ করা। প্রতিদিন দূরের গভীর নলকূপ থেকে পানি আনতে তাঁকে দীর্ঘ পথ হাঁটতে হয়। এতে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কখনও অসুস্থও হয়ে যান তিনি। আর যদি কোনো দিন সেই দূরের নলকূপে যাওয়া সম্ভব না হয়, তখন বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয় পুকুরের অনিরাপদ পানি। অথচ শুষ্ক মৌসুমে সেই পুকুরও শুকিয়ে যায়। নদী ও খালের পানি তখন অতিরিক্ত লবণাক্ত হয়ে ওঠে। ফলে বিশুদ্ধ পানির সংকট ভয়াবহ রূপ নেয়। এমন দিনও আসে, যখন পানির অভাবে রান্না করাও কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে মিষ্টি বা উপহারের বদলে কয়েক বোতল মিনারেল ওয়াটার নিয়ে এলে উপকূলের মানুষ যেন বেশি খুশি হয়।

সুপেয় পানির জন্য এই হাহাকার শুধু খুলনার উত্তর বেদকাশীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ উপকূলজুড়ে এটি আজ এক ভয়াবহ বাস্তবতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সব পানির উৎসে লবণাক্ততার মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে বঙ্গোপসাগরের নোনাপানি নদী ও খালে প্রবেশ করে সেগুলোকেও লবণাক্ত করে তোলে। ফলে নিরাপদ ও সুপেয় পানির সংকট দিন দিন আরও তীব্র হয়ে উঠছে।

‘অ্যা-ক্রসসেকশনাল ভিউ অব দ্য ড্রিংকিং ওয়াটার সিনারিও ইন আ ক্লাইমেট-স্ট্রেসড সেটিং: কেস স্টাডি ফ্রম সাউথওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ’ শীর্ষক গবেষণায় উঠে এসেছে এক উদ্বেগজনক চিত্র। গবেষণা অনুযায়ী, উপকূলীয় অঞ্চলের একজন নারীকে প্রতিদিন শুধুমাত্র এক কলস বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহের জন্য পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়। বছরের চার থেকে সাত মাস পর্যন্ত এই সংকট স্থায়ী থাকে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এ অঞ্চলের প্রায় ৮৪ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব কোনো নিরাপদ পানির উৎস নেই। ফলে তাদের নির্ভর করতে হয় বাইরের উৎসের ওপর, যা অনেক সময় দূরবর্তী, অনিরাপদ কিংবা ব্যয়বহুল।

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের তথ্য অনুযায়ী, গত চার দশকে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ভূপৃষ্ঠই নয়, ভূগর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততার প্রভাব ভয়াবহভাবে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে উপকূল থেকে প্রায় ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার উজান পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে স্বাদুপানির প্রাকৃতিক উৎসগুলো ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং নিরাপদ পানির সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিই এই সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ। সমুদ্রের নোনাপানি ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে প্রবেশ করায় লবণাক্ততার বিস্তার বাড়ছে, অন্যদিকে ভূপৃষ্ঠের নিচে থাকা স্বাদুপানির মজুত কমে যাচ্ছে। এতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের মোট আবাদি জমির প্রায় ৩০ শতাংশ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত, যার মধ্যে প্রায় ৫৩ শতাংশ জমি সরাসরি লবণাক্ততার শিকার। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ২৮.৬ লাখ হেক্টর উপকূলীয় এলাকার মধ্যে ১০.৫৬ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, জীবিকা সংকুচিত হচ্ছে এবং মানুষ বাধ্য হয়ে এলাকা ছাড়ছে।

জলবায়ুগত এই সংকটের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। উপকূল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া পরিবারগুলোও বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা পায় না। উপকূলের অধিকাংশ গ্রামে বর্তমানে সুপেয় পানির প্রধান ভরসা গভীর নলকূপ বা ডিপ টিউবওয়েল। প্রতিদিন ভূগর্ভ থেকে লাখ লাখ লিটার পানি উত্তোলন করা হলেও ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততার কারণে অনেক জায়গায় সেই পানিও নিরাপদ থাকছে না। ফলে উপকূলের বহু পরিবার এখন টাকা দিয়ে বিশুদ্ধ পানি কিনতে বাধ্য হচ্ছে। আর যাদের সেই সামর্থ্য নেই, তারা বাধ্য হয়েই লবণাক্ত পানি পান করে জীবনযাপন করছে। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে, পাশাপাশি অর্থনৈতিক চাপও তীব্র হচ্ছে।

গত ২৫ থেকে ৩০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শুষ্ক মৌসুমে পানির উৎসগুলোতে লবণাক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। ফলে প্রতি বছরই দেখা দিচ্ছে সুপেয় পানির তীব্র সংকট। যারা বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করতে পারে, তারা শুষ্ক মৌসুমে কিছুটা স্বস্তিতে থাকে। কিন্তু যাদের সেই সুযোগ নেই, তাদের খাওয়া-দাওয়াসহ দৈনন্দিন প্রায় সব কাজে বাধ্য হয়ে নোনাপানিই ব্যবহার করতে হয়।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ১৯টি জেলায় প্রায় ৪ কোটি ৩৮ লাখ মানুষের বসবাস। সম্ভাবনাময় ও সম্পদসমৃদ্ধ এই অঞ্চল আজ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততার বিস্তার উপকূলীয় মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ক্রমাগত সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষ করে ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলার পর উপকূলের প্রায় সব মিঠাপানির উৎস লোনাপানিতে দূষিত হয়ে পড়ে। পুকুর, খাল, নদী ও ভূগর্ভস্থ পানির উৎসগুলোতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় সুপেয় পানির তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষিজমির উর্বরতা কমে যাওয়ায় ফসলের স্বাভাবিক উৎপাদনও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপকূলীয় অঞ্চলে লোনাপানি ও ভূগর্ভস্থ মিঠাপানির মধ্যে একটি স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান থাকে। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জলাশয় ও মাটির নিচে স্বাদুপানির মজুত তৈরি হয়। অন্যদিকে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রভাবে লোনাপানি ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটি সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সেই ভারসাম্য এখন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সমুদ্রের নোনাপানি ধীরে ধীরে লোকালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে মিঠাপানির উৎসগুলোকে দূষিত করছে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সব পানীয় জলের উৎসই আজ ঝুঁকির মুখে।

বর্তমানে উপকূলের লবণাক্ত এলাকাগুলোতে নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মিঠাপানির পুকুর, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, গভীর নলকূপ, পাইপলাইনের পানি সরবরাহ, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) এবং রিভার্স ওসমোসিস বা আর.ও. প্ল্যান্ট। এর মধ্যে ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানি উত্তোলনের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় গভীর নলকূপ।তবে উপকূলের অধিকাংশ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অনেক নলকূপে আর পানি ওঠে না। আবার কোথাও কোথাও পানি উঠলেও সেটি লবণাক্ত হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলে পাইপলাইনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধন করে সরবরাহ করা হলেও সেই পানি সবসময় নিরাপদ ও মানসম্মত হয় না। ফলে নিরাপদ পানির সংকট দিন দিন আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত তিন হাজার মিলিমিটারেরও বেশি। তাই বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর ও টেকসই সমাধান। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মাটির পাত্র, মটকা বা ড্রামে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে আসছে। বর্তমানে ঘরের চাল বা ছাদ থেকে পাইপের মাধ্যমে ট্যাংকে পানি জমিয়ে রাখার পদ্ধতি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা গেলে এই পানি কয়েক মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব। সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা অসচ্ছল পরিবারগুলোকে পানির ট্যাংক সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধানের জন্য প্রয়োজন বৃহৎ পরিকল্পনা ও কার্যকর বাস্তবায়ন।

উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।এগুলো হলো বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, নতুন খাসপুকুর খনন ও পুরোনো পুকুর পুনঃখনন, পুকুরে লবণপানি প্রবেশ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরাপদ গভীর নলকূপ স্থাপন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পমূল্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে পানি ব্যবস্থাপনার টেকসই মডেল গড়ে তোলা ।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সুপেয় পানির সংকট এখন শুধু পরিবেশগত নয়, বরং মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে এই সংকট দিন দিন আরও গভীর হচ্ছে। এখনই কার্যকর পরিকল্পনা ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ না করলে উপকূলের মানুষের জীবনযাপন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠবে। সুপেয় পানির নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা শুধু একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা নয়, এটি উপকূলবাসীর বেঁচে থাকার অধিকার। বাংলাদেশের উপকূলের জন্য নিরাপদ পানির একটি বৃহৎ ও টেকসই প্রকল্প সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

#

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

পিআইডি ফিচার